আমাদের অস্তিত্ব ‘মুক্তির গান’

*১৯৯৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মুক্তির গান’ তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র। যেই শেকড়ের শক্তিতে বাঙালি জাতি দাঁড়িয়ে আছে সেই ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এই প্রামাণ্যচিত্রে। **মৌ সন্ধ্যার** প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা নিয়ে রঙ বেরঙের নিয়মিত আয়োজনে এ পর্বে আমরা জানার চেষ্টা করবো ‘মুক্তির গান’ নিয়ে।*

তারেক মাসুদের হাত ধরে লিয়ার লেভিনের স্বপ্ন পূরণ

মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণের অভিপ্রায়ে এদেশের একদল সাংস্কৃতিক কর্মীর সঙ্গ নেন। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা নামের দলের এই সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী গান শুনিয়ে উজ্জীবিত করতেন। এই শিল্পীদের সাথে থেকে লেভিন প্রায় ২০ ঘণ্টার ফুটেজ সংগ্রহ করেন। যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তিনি ডকুমেন্টারি তৈরি করতে পারেননি। তার এই অসমাপ্ত কাজটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ।

মুক্তিযুদ্ধের দুই দশক পর

স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ দুই দশক পর ১৯৯০ সালে তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ নিউ ইয়র্কে লেভিনের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ২০ ঘণ্টার ফুটেজ সংগ্রহ করেন। এ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন তারা। আরো বিভিন্ন উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের নানা সংরক্ষিত উপাদান সংগ্রহ করেন, বিশ বছর আগের সেই শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ করেন। লেভিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফুটেজের সাথে সংগৃহীত অন্যান্য উপাদান যোগ করে নির্মাণ হয় ‘মুক্তির গান’।

মুক্তির গানের জয়জয়াকার

তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র মুক্তি পায় ১৯৯৫ সালে। এই প্রামাণ্যচিত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া থেকে এই চলচ্চিত্রটির জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ। এছাড়া ১৯৯৫ সালে শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায় চলচ্চিত্রটি।

‘মুক্তির গান’ চলচ্চিত্রের সংগীত

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পী মুক্তির গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন বিপুল ভট্টাচার্য, দেবব্রত চৌধুরী, দুলাল চন্দ্র শীল, নায়লা খান, লতা চৌধুরী, লুবনা মরিয়ম, মাহমুদুর রহমান বেণু, শাহীন সামাদ, শারমিন মুর্শিদ, স্বপন চৌধুরী, এবং তারিক আলী। এই সিনেমায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, আমিনুল হক চৌধুরী এবং নাম না জানা অনেক মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কান্না

১৯৯৫ সালের ঘটনা। ‘মুক্তির গান’ ছবির প্রদর্শনী হচ্ছিল শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে। সম্ভবত সেটিই ছিল ছবির প্রথম প্রদর্শনী। শো শুরুর পর তা দেখতে মিলনায়তনে ঢোকেন শেখ হাসিনা। তখন তিনি বিরোধীদলের নেত্রী। কিন্তু সেদিকে কারও নজর নেই! হল ভর্তি দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে দেখেন মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত এক ছবি! ছবির শেষ দৃশ্যে বিজয় উল্লাসে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে একদল মুক্তিযোদ্ধার জয় বাংলা ধ্বনির সঙ্গে শামিল হন হল ভর্তি সব দর্শক। অনেকক্ষণ ধরে চলে বিজয়ের স্লোগান, জ-য়-বাং-লা! অনেকে সেদিন দেখেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর চোখের কোণে পানি। পরবর্তীতে তিনি বহুবার প্রশংসা করেছেন এই চলচ্চিত্রের।

কি আছে 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রে?

সঠিকভাবে স্বাধীনতার ইতিহাস জানার জন্য 'মুক্তির গান' একটা দলিল। এখানে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গন, মুক্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে ছবি তোলেন একজন ফ্রি ল্যান্সার বিদেশি সাংবাদিক। শাহীন সামাদসহ শিল্পীদের একটি গানের দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরেও তিনি অনেক ছবি তুলেছেন। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিপদে পড়েন ওই বিদেশি ফ্রি ল্যান্সার। তার ধারণ করা ছবি আর কেউ কিনতে চায় না। মনের দুঃখে ফিল্মগুলো কাঁচা অসম্পাদিত অবস্থায় নিজের বাড়ির একটি বাক্সে রেখে দেন। এরপর অনেকদিন অন্য কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে যাওয়াতে বাক্সবন্দী ফিল্মগুলোর কথাও ভুলতে বসেছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় কুড়িগ্রামের রৌমারি-রাজিবপুরসহ নানান মুক্তাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ওই ফ্রি-ল্যান্সারের গল্প শোনেন তারেক মাসুদ। কিন্তু কেউ নিশ্চিতভাবে তার নাম-ঠিকানা বলতে পারছিলেন না। শুরু হয় অনুসন্ধান। জানতে পারেন ওই বিদেশি ফ্রিল্যান্সার ছিলেন লেয়ার লেভিন। আমেরিকান নাগরিক। অনেক খুঁজে সরাসরি তার বাড়িতে চলে যান তারেক দম্পতি। বহু বছর পর বাংলাদেশ থেকে গিয়ে তার তোলা ছবির খোঁজখবর নিতে দেখে লেয়ার লেভিন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। ধূলোর পলেস্তরা মুছে তখনই সমুদয় ফিল্ম বিনামূল্যে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, দেখো যদি তোমাদের কোনো কাজে লাগে!

সেই ফিল্মের স্তূপ থেকেই ঘষামাজা, এডিটিং এর মাধ্যমে সাজানো হয় মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত ছবি 'মুক্তির গান'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আর সব ছবির সঙ্গে এর পার্থক্য এটিতে কোনো স্ক্রিপ্ট অথবা অভিনয়ের বিষয় ছিল না। পুরোটাই জীবন্ত প্রামাণ্য ছবি মুক্তিযুদ্ধের।

মুক্তির গানের মুক্তি

সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার আগে সেন্সরবোর্ডের কাছ থেকে যেসব দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল তারেক মাসুদ ২০০৭ সালে তা-ই লিখেছিলেন 'মুক্তির গানের মুক্তি' শিরোনামে একটি সাহিত্য পাতায়। তারেক মাসুদের এই লেখাটি থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চলুন পড়ে দেখা যাক: ১৯৯০ সালে নিউ ইয়র্কের এক অভিজাত এলাকার বাড়ির বেজমেন্টে বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ উদ্ধার করে তা থেকে ৪ বছর ধরে 'মুক্তির গান' নির্মাণ করে যখন দেশে ফিরলাম তখন ভাবিনি নিজের দেশের সেন্সর বোর্ডে ৪ মাসের জন্য আবার বাক্সবন্দি হয়ে পড়বে। '৯৫ সালের গোড়ার দিকে আমরা ৪৩৫ মিলিমিটারের প্রিন্ট নিয়ে দেশে ফিরি। মাথায় দুশ্চিন্তা-প্রামাণ্যচিত্র মুক্তি দিতে সিনেমা হলগুলো রাজি হবে তো? সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী হাবিব খান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আশ্বস্ত করলেন এই ছবি দেখতে সিনেমা হলে মানুষ আসবে।

শ্রদ্ধাভাজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল্লাহ খান বাদল ও নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু আগে থেকেই ছবিটি শেষ করার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। কথা হয়েছিল তাদেরই পরিবেশনা সংস্থা 'সম্ভারে'র মাধ্যমে মুক্তির গান পরিবেশিত হবে। ধারদেনা, ক্রেডিট কার্ড ও ব্যক্তিগত চাঁদার মাধ্যমে ছবিটি নির্মাণ শেষ হলেও 'সম্ভারে'র সহয়তায়ই চার চারটি প্রিন্ট করা সম্ভব হয়েছিল। ছবিটি সেন্সর বোর্ডে যখন জমা দিলাম তখন দুই বছর ধরে ক্রেডিট কার্ডের সুদ পরিশোধ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। যথারীতি সেন্সর বোর্ডে ছবি প্রদর্শনীর দিন-তারিখ ঠিক হলো। নিউ ইয়র্কের দামি ফিল্ম ল্যাবের প্রিন্ট সেন্সর বোর্ডের মধ্যযুগীয় প্রজেক্টরে যাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য নিজেরাই প্রজেক্টর মেরামত করে নিজেরাই চালালাম।

বোর্ডের সদস্যরা আমাদের চার বছরের সীমাহীন কষ্ট, বেদনা আর পরিশ্রমের ফসল ছবিটি কি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখতে শুরু করল তা প্রজেকশন রুম থেকে দেখে আমাদের মনটা আরও দমে গেল। বোর্ডের সদস্যদের জন্য পর্যায়ক্রমে কেক, কলা, কোকাকোলা ও চা আসতে থাকল। পিয়ন বেয়ারার কাপ, গ্লাস, ট্রে নিয়ে অনবরত যাওয়া-আসা আর আওয়াজের মধ্য দিয়ে প্রথম ১০-১৫ মিনিট কেটে গেল। কিন্তু চা পর্ব শেষ হলে এবং বয়-বেয়ারাদের আতিথেয়তা থিতিয়ে এলে বোর্ড সদস্যদের বিরামহীন বকবকানিও আস্তে আস্তে থেমে আসতে শুরু করল। ততক্ষণে ছবিটি বিপুল ভট্টাচার্যের 'এই না সোনার বাংলা' গানটিতে এসে পৌঁছেছে। এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে সবাই ছবিটি দেখছে। বুঝতে পারলাম সমাজের তথাকথিত অভিভাবকদের ওপর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সূচিত হয়েছে। কিছুক্ষণ পর অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করলাম যারা মুক্তির গানকে আর দশটা ধুম-ধাড়াক্কা ছবি হিসেবে গণ্য করে খাওয়া-দাওয়া আর গল্পগুজব করে যাচ্ছিল তারা ছবির দেশাত্মবোধক গানগুলোর সঙ্গে তাল দিতে শুরু করেছে। প্রায় নিশ্চিত হলাম ছাড়পত্র পেয়ে যাব। সদস্যরা ছবি দেখে আমাকে ও ক্যাথরিনকে ডাকলেন। সবাই জানালেন তাদের কোনো আপত্তি নেই, তবে এক সদস্যের দুটি ছোট প্রশ্ন আছে। একটি কলেজের শিক্ষিক-সদস্য বললেন মুক্তিযোদ্ধারা যখন রেডিওতে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনছেন তখন আমরা কেন জিয়াউর রহমানের ছবি ব্যবহার করিনি। উত্তরে আমি বললাম, এটি একটি প্রামাণ্য দৃশ্য। এখানে তো জিয়াউর রহমানের কোনো ছবি ছিল না এবং থাকারও কথা না। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা জিয়াউর রহমান দেখতে কেমন, বা তার চেহারার সঙ্গেও পরিচিত না। আর যদি এটা কাহিনীচিত্র হতো তাহলে ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করে জিয়াউর রহমানের পোট্রেট ব্যবহার করতে পারতাম, যেন জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের মনের মুকুরে তাদের নেতার ছবি ভেসে এলো। তখন তিনি বললেন, এটা না হয় বুঝলাম; কিন্তু আপনি জিয়াউর রহমানের মূল ঘোষণাটি কেন ব্যবহার করেননি? উত্তরে আমি বললাম, এটা শুধু মূল ঘোষণাই নয়, এটি জিয়াউর রহমানের ঘোষণার একমাত্র এভেইলেবল রেকর্ডিং। অন্য কোনো ঘোষণার অস্তিত্ব কোথাও নেই। এটি আমি জার্মানের ডয়েচে ভেলের রেডিও আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করেছি। তখন তিনি বলেন, এটা তো ইংরেজি ঘোষণা, উনি বাংলায় আরেকটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। আপনি সেটা বিদেশে নয়, দেশে খোঁজ লাগিয়ে দিন। অবশেষে আমি বললাম, আমি আড়াই বছর গবেষণা করে এটাই পেয়েছি। তারপরও আমি দেশের সংশ্লিষ্ট যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে খুঁজে দেখব। আমি আরও বললাম, ছবিতে আপনাদের কি আর কোথাও কোনো আপত্তি আছে?

সবাই বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে মূল ঘোষণাটি সংযোজন সাপেক্ষে আপনাদের আর কোনো আপত্তি নেই, সেটা জানিয়ে আমাকে একটি চিঠি লিখবেন। তারা আমাকে সেই চিঠি দিলেন। এরপরে আমি বাংলাদেশ রেডিও, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদফতর, জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভ, জাতীয় মহাফেজখানাসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানে জিয়াউর রহমানের মূল ঘোষণাটি তাদের সংরক্ষণে আছে কি না জানিয়ে আমি তাকে চিঠি দিতে অনুরোধ জানালাম। প্রায় এক-দেড় মাস লাগিয়ে সবগুলো প্রতিষ্ঠানই অবশেষে আমাকে চিঠি দিলেন যে ঘোষণাটি আমার ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে ভিন্ন কোনো রেকর্ডিং তাদের কাছে নেই। প্রতিষ্ঠানগুলোর এই চিঠিগুলো আমি সেন্সরবোর্ডে জমা দেই। তারপরও চার মাস সেন্সরবোর্ড আমাকে বিভিন্ন অজুহাতে ঘোরাতে থাকে। অবশেষে ১৪ জুন, ১৯৯৫ সালে সংবাদ সম্মেলন করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটা জানানোর ঘোষণা দিলে সেন্সরবোর্ড তড়িঘড়ি করে আমাকে ছবিটি আনকাট সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। এভাবেই 'মুক্তির গান' ছবিটি দ্বিতীয়বারের মতো বাক্সবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে। তবে, সাধারণ মানুষের কাছে ছবিটি মুক্তি দিতে আরও ৬ মাস লেগে যায়। পরিশেষে পরিবেশকহীন এক বিচিত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে '৯৫ সালের ডিসেম্বরের ১ তারিখে মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীর প্রাক্কালে 'মুক্তির গান' মুক্তির আলো দেখলো।

শেষকথা

সব মিলিয়ে মুক্তির গানের মাধ্যমে তারেক মাসুদ আমরা যারা যুদ্ধ দেখিনি তাদের জন্য তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত এক দলিল চিত্র। 'মুক্তির গান' দিয়ে তার যাত্রা শুরু। পরে 'মাটির ময়না', অন্তর্যাত্রা', 'আদম সুরত', 'রানওয়ে', 'নরসুন্দর' অনেক কাজ করছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ তাকে থেমে যেতে হয়। ১৩ আগস্ট ২০১১ দুপুরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। তারেক মাসুদ নেই, তবে অমর হয়ে আছে তার কাজ। চলচ্চিত্র সমালোচকরা 'মুক্তির গান'কেই তারেকের মাস্টারপিস কাজ বলে থাকেন। আমরাও সুর মিলিয়ে বলতে পারি আমাদের অস্তিত্ব আমাদের 'মুক্তির গান'।